শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সনেট : 'আঞ্চলিক দুফী–র নীলিমা'

সুব্রত রায়চৌধুরী

Abstract

The tight, systematic form of the sonnet and the intense, reckless lifestyle of Bengali poet Shakti Chattopadhyay were diametrically opposed. Yet, why did he embrace the sonnet in his early years as a poet, viewing it as an opportunity or support? Was there a poetic aesthetic driving this choice, or was it merely an exercise in mastering word control and arranging them in rhyme schemes? This article seeks to shed light on these questions while also exploring the form of sonnet that he idealized. Not only does Shakti exhibit a liberal, anti-fastidious attitude towards words, but he also blends so-called 'elegant' and 'crude' elements in an attempt to create a 'counterculture' in his poetry. Shakti Chattopadhyay's poetry remains untethered by the constraints of thought and language. Even clear utterances aspire to become subtle hints – a perspective that we will also explore.

Keywords: *Shakti Chattopadhyay, lifestyle, form, sonnet, obligation, practice, pattern, pure poetry, words, counterculture.*

নিজের কবিতাকে 'পদ্য' বলতে ভালোবাসতেন শক্তি। অথচ সেই তিনিই তাঁর সনেট–সংকলনের নাম দিয়েছিলেন **'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'**(১৯৭০)। **একালের কবিতানামধেয় লেখাগুলোকে ঠেস দেবার জন্যই** হোক কিংবা **বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে** চাওয়ার ইচ্ছা, যে 'পদ্য' শব্দ ছিল তাঁর কাছে **শুচিশুদ্ধতার নামাবলি**[১], **সুসামাজিকের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য যোগ্য কোনো অস্ত্র**[২], চতুর্দশপদী–র পরেও তাকে অতিরিক্ত কবিতা হয়ে উঠতে হয়েছিল কেন? এমনও কি হতে পারে, **'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'**–এর (১৯৬১) প্রথম সংস্করণের অশুদ্ধি–সংশোধন অংশ যেখানে কবিতাকে প্রথম পদ্য বলতে শুরু করেছিলেন শক্তি, তার আগেই অধিকাংশ সনেট রচিত হয়ে গিয়েছিল বলে ইতিহাসের প্রশ্নে শব্দরক্ষা করেছিলেন! **ইতিহাসের দায়**ই কি তাহলে সমসাময়িক হতে চেয়ে 'সদর স্ট্রিট' সনেটটির **ঊনবিংশ ষাট এই সালে** চরণাংশটিকে বদলে মাত্রাসংখ্যায় মিলবে না জেনেও **১৯৭০** করে নিয়েছিল? নাকি,

ভাবের সংহতি ও নির্মিতির প্রশ্নে সনেট রূপবন্ধটিকেই কবিত্বের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা বলে মনে হয়েছিল তাঁর! শেষ সম্ভাবনাটিকেই মেনে নিতে মন চায়, কেননা **লণ্ঠনরহস্য থেকে কবিতাকে মুক্তি** দেবেন বলে সনেটের সদর স্ট্রিট–এ তাঁকে আসতে হয়েছিল একথা উপলব্ধি করেই :

নিভন্ত লণ্ঠন, ফাটা কাচ পলতে, আমারই কবিতা!
কবিতাকে গ্রাম্য ক্লেদ, পচা পিছুটান থেকে যত
তুখোড় শহরে আনি, ব্যথা পায়, সবজির মতন
লুপ্ত হতে থাকে আর ক্লোরোফিল বিশুদ্ধ প্রতীকে
অনূদিত হতে থাকে: অমন আলেখ্য তার অপ্সরার
কিম্ভূতকিমায় হয় বদখৎ.....।[৩]

গ্রাম্য ক্লেদ আর পচা পিছুটান থেকে তুখোড় শহরে নিয়ে এলেও যাতে **কবিতার অপ্সরার আলেখ্য কিম্ভূতকিমায় বদখৎ** না হয় গ্রাম আর শহরে, সাধু আর চলিতে, তৎসম আর দেশজে, প্রত্নবাংলা আর আধুনিক ককনিতে, অমিত্রাক্ষর আর পয়ারে, রীতি মানা আর না–মানার মধ্যে এমন কোনও রূপের সন্ধান কি দিতে পারল সনেট, যা মূর্ত হয়েও বিমূর্ত, নিপুণ নির্মাণ হয়েও শরীর থেকে শ্রম–চেষ্টার চিহ্ন মুছে হয়ে উঠতে চায় সৃষ্টি?

সনেটের কোন্ রূপ তাঁর আদর্শ ছিল একটি কবিতায় নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার :

মিল্টন মিল্টন তুমি চোখ খুলে লেখো তো সনেট
তর্কাতীত অন্ধতার 'পরে।
পাত্রাতুর পথে আমি যাইনি কখনো
সেখানে তুমি কি গেছো? একিলিস গেছে?[৪]

পাত্রাতুর পথে? ঝাড়খণ্ডের পাত্রাতু উপত্যকার সঙ্গে সনেটের সম্পর্ক কী! একদা সিংভূম–চাইবাসায় চষে–বেড়ানো শক্তির পাত্রাতু শব্দে সনেটের জনক বলে কথিত চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি ফ্রান্সেসকো পেত্রার্কার কথা মনে পড়েছিল নিশ্চয়ই। মনে পড়েছিল ভিন্ন মেরুর মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট', দুচোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যে–কাব্য আর শেষ করতে পারবেন না বলে মনে হয়েছিল কবির, যে কাব্যের শয়তান চরিত্রে ছিল গ্রিক মহাকাব্যিক চরিত্র একিলিসের ছায়া। পেত্রার্কাকে খানিকটা অনুসরণের পর মিল্টন পেত্রার্কীয় সনেটের অবলম্বন ধ্রুপদী প্রেমের পথ পরিত্যাগ করে ধর্ম–দর্শন–রাজনীতির বাহন করে তুলেছিলেন কবিতাকে। শরীর ও চরিত্রের যাবতীয়

সামর্থ্য সত্ত্বেও একটি পায়ের গোড়ালির দুর্বলতার কারণে যেমন পতন হয়েছিল মহাবীর একিলিসের, যেখান থেকে Achilles heel কথাটির উৎপত্তি, তেমনই মহাশক্তিধর মিল্টনের সনেটের প্রধান দুর্বলতা তার উদ্দেশ্যপ্রবণতা ও প্রচারধর্মিতায়, এমন ইঙ্গিতই যেন করতে চাইছিলেন **শুধু কবিতার জন্য কবিতা**পন্থী শক্তি। মিল্টন পরবর্তীতে অষ্টক–ষটক বিভাজনও মানেননি। হয়তো 'পরম এক'–এর প্রতি বিশ্বাস থেকেই সনেটের দৃঢ় কাঠামোতে কোনো ধরনের স্তবক–বিভাজনই আর মনঃপূত ছিল না তাঁর। ধ্বনিস্পন্দন অব্যাহত না–থাকলে ইতালীয় যে sonnetto শব্দ থেকে সনেটের উপত্তি, যার অর্থ মৃদু ধ্বনি, তার অখণ্ডতা বজায় থাকবে কী করে এমনটাই হয়তো বোধ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সনেটের দীর্ঘ ঐতিহ্যের বাহক শক্তি জানতেন, এই অষ্টক–ষটক বিভাজন শুধু একটি ভাবের উপস্থাপনা ও তার নির্দিষ্ট প্রায়োগিক উদাহরণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ভাবস্পন্দনের আবেগী প্রবাহের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়। শেক্সপিয়ার পেত্রার্কার দেখানো পথের সীমানা প্রসারিত করেছিলেন স্তবকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েই। চোদ্দটি চরণের সীমা স্বীকার করেও শেক্সপীয়রীয় সনেটে থাকত তিনটি চতুষ্ক আর শেষে দুটি সমিল পংক্তি। তিনটি চতুষ্ক কাব্যের শিখরে আরোহণের তিনটি সোপান যেন। উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ক্রমিক আরোহণের শেষে আসে যুগ্ম পংক্তি, আকস্মিকতার ঘোর লেগে যায়। এভারেস্টের শীর্ষে পৌঁছনোর বিস্ময়–মুগ্ধতা কবি–অভিযাত্রীর মতো পেয়ে বসে পাঠককেও। কবিতায় তাই তর্কাতীত অন্ধতার পরেও নিজের মিল্টন–প্রিয়তাকে চোখ খুলে সনেট লেখার আহ্বান জানিয়েছেন শক্তি। পেত্রার্কা–শেক্সপিয়র–মিল্টন–স্পেনসার–ফরাসি রীতির গ্রহণ–বর্জনে সংক্ষিপ্ততা, গভীরতা ও আন্তরিকতার যে অপরূপ স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন–রবীন্দ্রনাথ–প্রমথ চৌধুরী–জীবনানন্দ দাশ–বুদ্ধদেব বসুরা সৃষ্টি করেছেন সনেটের মেধাবী রূপবৈচিত্র্য, সেই পথই তাঁর পথ।

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩৬২) প্রকাশিত যে–কবিতাটিকে শক্তি তাঁর প্রথম কবিতার মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, সেই 'যম' কবিতাই একটি সনেট। পেত্রার্কীয় রীতি আছে কেবল অষ্টক–পর্যায়ে, ষটক অংশের মিলবিন্যাসে (ক–খ–গ, ক–খ–গ) শক্তি স্বাধীনতা নিয়েছেন :

সে–নারীকে যম বলি। দিনের নর্মদা
সন্ধ্যায় আহল্যা হয়, স্বর অনুত্তম,
কখনো দক্ষিণ নয় সে সুখের রং
অথচ সুভদ্র পর্ণে স্বস্থ, হে বসুধা,
যৌবন সহসা অঙ্গে জ্বলে জ্বলে সোম

নিলাজ নির্মল দেহ, বিভার সায়ং।[৫]

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'-র পূর্ববর্তী ১৯৫৫-৫৭ কালসীমায় রচিত যে ১০৬টি কবিতা আছে অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থের আদিরচনা-পর্বে, তার ২২টিই নিরেট সনেট! এছাড়াও এমন ১০টি কবিতা আছে, যেগুলিতে চতুর্দশ চরণের সীমা (৮টি কবিতা ১৬ পংক্তির, ২টি ১৫ পংক্তির) ইত্যাদি সনেটের কুললক্ষণ শক্তি হয়তো মানেননি, কিন্তু আঁটোসাঁটো বাঁধুনির কাঠিন্য, দুর্গমতা ও পরিমিতিবোধে সনেটের নবনিরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে রচনাগুলি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রথম দিকের সনেটগুলির কোনটিই অবিমিশ্রভাবে পেত্রার্কীয় (অষ্টক-ষটক স্তবক, মিলবিন্যাস : কখ-খক-কখ-খক, গঘ-গঘ-গঘ কিংবা গঘঙ-গঘঙ), শেক্সপীয়রীয় (৩টি চতুষ্ক ও ২টি সমিল পংক্তি, মিলবিন্যাস : কখ-কখ,গঘ-গঘ, ঙচ-ঙচ, ছ-ছ) কিংবা স্পেনসারীয় (শেক্সপীয়রীয় রীতির স্তবকসজ্জায় মিলবিন্যাসক্রম : কখ-কখ, খগ-খগ, গঘ-গঘ, ঙ-ঙ) নয়। স্তবকসজ্জা ও মিলবিন্যাসে নানান রীতির বিন্যাস ও সমবায়। শক্তির সেই তারুণ্যের খাতাগুলিতে, খাতায় লেখার অজস্র কাটাকুটিতে, পাতায় পাতায় মাপ অনুযায়ী অজস্র শব্দের প্রতিশব্দ লিখে রাখায়, চরণের শেষে ধরে-ধরে abba cddc লিখে মিলবিন্যাস প্রয়াসে, শব্দের মাত্রাগণনায় যে বিপুল অভিনিবেশ ও পরিশ্রমের সাক্ষ্য আছে, তা যে কোনও তরুণ কবির আদর্শ হতে পারে। 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' সংকলনের ভূমিকায় সমীর সেনগুপ্তের লেখা কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এ-প্রসঙ্গে:

> যাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যার এলোমেলো নিয়মহীনতা কয়েক বছরে কিংবদন্তিতে পরিণত হবে, তিনিই কবিতার জন্য বেছে নিলেন সনেট সেই মাধ্যম যা কঠিনতম নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ। একি শুধু এক শক্তিশালী তরুণ কবির উদ্ধত খেয়াল, নাকি এই নির্বাচনের পিছনে কাজ করেছে নন্দনতত্ত্বের কোনো রহস্যময় কিন্তু অমোঘ নিয়ম? হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল সনেটকে অধিগম্য করতে পারলে কবিতার অন্যান্য প্রযুক্তি কৌশলও তাঁর অনায়ত্ত থাকবে না। হয়তো এলোমেলো জীবনযাপনের প্রতিসাম্য হিসেবেই তাকে আকর্ষণ করেছিল সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ লাবণ্য? দ্বিতীয়টিই বিশ্বাস করতে লোভ হয়।[৬]

কেবল সনেট নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (মে ১৯৭০), সেখানে সনেটসংখ্যা ১০১ (উৎসর্গ কবিতা ১০০)! গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শক্তি লিখেছিলেন :

> প্রকৃতপক্ষে পদ্যলেখা যখন এবং যেদিন শুরু করি, বিধিবদ্ধ চতুর্দশী দিয়েই করেছিলুম। যতদূর মনে পড়ছে ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে গতকাল পর্যন্ত যত

চতুর্দশপদী লিখেছি প্রায় সবকটিকেই একত্র বসানোর পরিকল্পনা ছিল।[৭]

কিন্তু পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। মনে হয় '১০১ সনেট' এরকম কোনো চমকপ্রদ ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল কবির কাছে। ফলত কিছু সনেট বাকি থেকে যায়, ৯টি সনেট গ্রন্থবদ্ধ করতে হয় পরবর্তী কাব্য 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি'–তে। 'যম' (১৯৫৬–৫৭) থেকে পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি ১৪১৫ বছর ধরে শক্তির সনেট–রচনাপ্রসঙ্গে সমীর সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> ভাবতে অবাক লাগে, এক ধরনের এই সনেটগুলি রচনা করার মানসিক অখণ্ডতা তিনি কী করে এত বছর ধরে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনেতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন কী তুমুল ও ঘটনাবহুল ছিল তাঁর জীবনের এই বছরগুলি! প্রেসিডেন্সি কলেজ – চাইবাসা পর্ব – সিংভূমের অরণ্যে পাহাড়ে অসম্ভব স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন – প্রথম কাব্যগ্রন্থ, প্রথম উপন্যাস – বিপুল খ্যাতি ও অখ্যাতি – কৃত্তিবাস, গীনসবার্গ, হাংরি আন্দোলন, সাপ্তাহিক কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা – চাকরি পাওয়া ও ছাড়া – প্রণয় ও বিবাহ – 'ধর্মে আছো...', 'সোনার মাছির...'র সম্পূর্ণ অন্যসুরে কবিতা রচনা এতসব উত্তাল তরঙ্গের নিভৃত অন্তরে গুণিকন্ঠের বিচিত্রদ্যুতি সুরসৃষ্টির অন্তরালে তানপুরার অনাহত ধ্বনির মতো এই আপাত–অনুচ্ছল কিন্তু দৃঢ়পিনদ্ধ লাবণ্যে পরিপূর্ণ কবিতাগুলি তিনি একটি একটি করে রচনা করে গেছেন।[৮]

১০১টি সনেটের মধ্যে প্রথানুগত্য কেবল দুটিতে। ২ এবং ৬১–সংখ্যক সনেট শেক্সপীয়রীয় রীতির। বাকি সনেটগুলির মিলবিন্যাসে সমস্ত রীতির সংমিশ্রণ যেমন আছে, তেমনি আছে মিলগন্ধহীন গদ্যকবিতাও। বিধিবদ্ধভাবে শুরু করে কীভাবে বিধি–ভাঙার দিকেই সরে গিয়েছিলেন তিনি, কয়েকটি উদাহরণেই তা স্পষ্ট হতে পারে:

১–সংখ্যক :

ফুলের বিছানা দেখে মনে হল শূন্যতা যাবার	ক
সময় হয়েছে। কোনো ভয় নেই। পরশকাতর	খ
শরীর আমার পাবে জীবনের একান্ত পাবার	ক
স্পর্শ, ঘরবাড়ি দরজা এমনকি গুগ্গুল আতর	খ
পাঞ্জাবি ভাসাবে। এই আতিশয্য মনে হবে ছার	ক
শূন্যতার কাছে যার জিহ্বা ছিল বিখ্যাত মেদিনী।	গ
ফুলের বিছানা দেখে মনে হয় শূন্যতা যাবার	ক
সময় হয়েছে। কোনো ভয় নেই। ফুলগুলি চিনি!	গ
সারল্যের কাছে যেতে ভাবতে হয় যাঁদের বয়স	ঘ

এখন যথেষ্ট। কেউ পারে, কেউ পারে না প্রয়াসে।	ঙ
উচিত কাঁটায় পরবশ্যতাও ম্লান হয়ে আসে	ঙ
জানি। অধঃপতনের মূলে ছিল শান্ত দুঃসাহস।	ঘ
ফুলের বিছানা দেখে মনে মোর শূন্যতা যাবার	ক
সময় হয়েছে। কোন ভয় নেই ফুলগুলি চিনি।[৯]	গ

২–সংখ্যক :

এখন জেনেছি আমি একা নই, বহু মানুষের	ক
আমার চেয়েও বড় দুঃখ আছে, হতাশ্বাস আছে	খ
এখন জেনেছি আমি একা নই, মেঘ–ফানুশের	ক
রাজ্যে আমি একা নই, কম্পমান নীলিমার কাছে	খ
অনেক মানুষ আছে অতিদূর শতাব্দীর জ্ঞান	গ
ধরে যারা, দুঃসময় তাদের চিত্তের মতো আমি কিনা	ঘ
কয়েক বছর বাদে–বাদে আসে সততা সন্ধান	গ
করেও দিনান্তে পেলে মুহুর্মুহু আমারই ঠিকানা	ঘ
কার দুঃখ বৃহত্তর? কার হতাশ্বাস এরও পরে?	ঙ
বাংলার কৃত্রিম দেশে জন্মক্ষণ–জড়ানো মিনার	চ
ফেলে এসে দাঁড়িয়েছি অবাস্তব বিমর্ষ শহরে	ঙ
আমার আগে ও পিছে লক্ষ লক্ষ অমূল কিনার	চ
ফুলের মানুষ। আমি একা নই দুঃখে নিরঙ্কুশ	ছ
একা নই লক্ষ্যভ্রষ্ট, চতুর্দিকে মানুষ মানুষ।[১০]	ছ

৫–সংখ্যক :

একবছর ধরে একটি শেফালিতলায় শুয়েছিলাম কেমন / মনে পড়ে। গরমের দিনগুলি মদের ঢাকায় / চৈতন্যবিহীন বহু তীব্রতর স্বপ্ন দেখেছিলাম–/ সেইসব দিনগুলি বৃষ্টিতে নরম হয়ে গেছে। / একবছর ধরে সেই শেফালিতলায় অর্ধস্ফুট / ময়ূরের, মাছিদের, বহু প্রাণিদের যাতায়াত / দেখিয়াছি একহারা ফ্রকঢাকা মেয়ের মহল / শেফালির চৌহদ্দির মাঝখানে হৃদয় যেখানে / তারপর একদিন শেফালিরে লাগিল না ভালো–/ চলিলাম। লাগিল না ভালো কারে লাগিল না আর / শেফালি ঝরিয়া গেল তেমনই সামান্য বাতাসে/ উঠানের বুক ভরে খাড়া উঠে গেল মুথা ঘাস–/ কেবল লাগিল ভালো জ্যোৎস্নায় স্থাপিত হয়ে যবে পক্ষকাল গৃহচূড়ে বসে দেখা মানুষ ময়ূর![১১]

নিয়ম মানা এবং না মানার যে আশ্চর্য সহাবস্থান ছিল তাঁর চরিত্রে, সনেটগুলি তার

উদাহরণ হয়ে আছে। চতুর্দশপদী কবিতাবলী–র প্রথম সনেট, যেটি উৎসর্গ করা হয়েছিল বাংলা চতুর্দশপদীর প্রথম প্রণেতা মাইকেল মধুসূদনকে, প্রকৃতপক্ষে 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যের 'সদর স্ট্রিট' কবিতার পুনর্মুদ্রণ যেটি, সামান্য পার্থক্য আছে কেবল দশম পংক্তিতে, সেই সনেটে তিনি লিখেছিলেন :

যে শিল্প ঐকিক নয়, তারে করো দান শূদ্রাণীরে
চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে, যদি কারো
সাধ্য থাকে! গালো পিত্ত, গালো চোখ, বেটে করো কিমা
কলকাতায় ভেসে ওঠে আঞ্চলিক দুফী–র নীলিমা।
তুমি পারো মেলে ধরতে খোলা–বুকে স্বেচ্ছাচারী ভাষা
ডায়েরির বিষণ্ণ পাতা জড়ো করে পোড়াতে আগুনে।[১২]

কবিতাটির নাম 'সদর স্ট্রিট' রেখেছিলেন কেন তিনি 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'–এর কালে, প্রথমতম কাব্যগ্রন্থে? মধুসূদনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও নিশ্চিত মন–জুড়ে ছিল তাঁর, অনন্য হয়ে ওঠার প্রশ্নে ভিতরে ভিতরে দরকার ছিল যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। কবিতার খোলা বুকে মেলে ধরতে চেয়েছিলেন এমন এক স্বেচ্ছাচারী ভাষা, যে ভাষা সনেটের ক্লাসিক গড়নের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে লেখে 'যে শিল্প ঐকিক নয়, তার গালো পিত্ত, গালো চোখ, বেটে করো কিমা !' সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখবেন :

> গোড়ার দিকে ওর কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারে আমার খুঁতখুঁতুনি ছিল। সাধুচলিত আর কাব্যিক শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি ছিলাম উগ্রচন্ডী। সে তুলনায় শক্তি ছিল সেয়ানা। তাই অর্ধেক ছাড়তে দ্বিধা করেনি।[১৩]

উপর্যুক্ত সনেটটিতে **পুস্তক** আর **গালো** এত সহজ স্বাভাবিকতায় কাছাকাছি বসে যেতে পারে যে, পাঠকের বিস্ময় অপেক্ষা করতে পারে দুফী–র নীলিমা পর্যন্ত। আর সেই আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে পাঠক দেখে, ফরাসি চিত্রকর ও লিথোগ্রাফার Raoul Dufy–র আঁকা ছবিতে যে নীল রঙের প্রাধান্য, তার নীলিমা দেশজকেও (**আঞ্চলিক**) ডেকে নিয়েছে আভিজাত্যের নীলে। প্রথমের **ঐকিক** শেষের **লোকায়তিক**–এর সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছে এমন এক ধ্বনিস্পন্দ, যার জন্য মধুসূদন–রবীন্দ্রনাথ–প্রমথ চৌধুরী–বুদ্ধদেব বসুর পরেও বাংলা সনেটের প্রতীক্ষা ছিল যেন আরও এক আরম্ভের।

সংহতির মধ্যে থেকেও শক্তির সনেটের কিছু কিছু কথা যে নিজের ঔজ্জ্বল্যে বিশেষ হয়ে উঠতে চায়, হাঁটা দেয় প্রবাদের পথে, তার কারণ আবেগের উচ্চারণ আর নির্লিপ্তি। যেন কোথাও কোনো মানদণ্ডে যাচাই হয়ে গেছে সেই অনুভব, তার আর অন্যথা নেই যখন, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন :

১. সকল সুঠাম বৃক্ষে মৃত্যু ও স্তব্ধতা ঢাকা আছে।[১৪]

২. কোথা যাবে? ঝরে ফুল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না? কোথা যাবে? ঝরে ফল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না?[১৫]

৩. তুমি যত খুলে যাও প্রিয় যাই কেবলই জড়িয়ে।[১৬]

৪. প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন জমে ওঠে।[১৭]

৫. মাধবের কোলে বসে ফলের নির্যাস খেতে চাই।[১৮]

৬. সকল হত্যারে মনে হয় অতি ভালোবাসাভরা ঐকান্তিক সাধের পতন।[১৯]

৭. অলৌকিকতার কাছে সকল আকৃতি ঝরে যায়।[২০]

কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হয় যখন, তখন সে-কবিতা একটি একটি করে উন্মোচন করতে থাকে নিজের পাপড়ি। যেন দেখিয়ে বলতে চায়, এভাবে পরত খুলে খুলে যেতে পারো, কিন্তু অন্তরতম নিভৃত সৌন্দর্যকে তো পাবে না সবকিছু জড়িয়েই আছে, কিন্তু সে এখানে নেই :

প্লাতেরো, তোমারে প্রিয় ঈর্ষা করি, তুমি বহুদিন
আমার বুকের পাশে ঘুমায়েছো পিঠের উপরে।
আমার গোলাপ গুলি খেয়ে গেছো, ভবিষ্য-ভরা
কবিতার খাতাগুলি স্মরণীয় রুমালের ঝাঁক।
তবু তোমারে কিছু বলি নাই, আত্মসাবধান
করেছি বাবার মতো। দূরদেশে গিয়েছি কখনো
তুমি কি কখনো আর বহিবে না, বহিব একাকী
দুঃখ ও স্মৃতির ভার, উপরন্তু, তোমারে, দিবসে?
শোনো বেড়াবার গল্প বহু পুরাতন গল্প নয়
তোমার অদ্ভুত চোখ চাহিল বারেক মুখপানে
মুহূর্তে উদ্দিষ্ট তব দেখি কোনো নতুন কবিতা
কী ভীষণ ভালোবাসো মদীয় কবিত্বে স্নানাহার!
প্লাতেরো তবুও কোন্ মায়াবী ভিতরে ডেকে যায়
তুমি যত খুলে দাও, প্রিয় যাই কেবলই জড়িয়ে![২১]

কবিতা শুরু হয়েছিল সঙ্গী গাধার উদ্দেশে স্বগতকথনে। কিচ্ছুটি বোঝে না বলেই সে গাধা, না বুঝে এই থাকতে-পারা সে কী কম ভাগ্যের! **জানিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম ভার** যাকে সইতে হয় না, তার নির্বিকার শিশুমুখ দেখলে ঈর্ষা হয়। সে খেয়ে নেয় ভালোবাসার গোলাপ, ভবিষ্য-ভরা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবিতার খাতাগুলি। চাঁদ মাথায় নিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে হাঁটছেন যে-কবি, তাঁর ভালোবাসা এই অবুঝপনায়

আরও বেড়ে যায় যেন। স্নেহে বাবার মতো হয়ে ওঠেন তিনি। পিতা কোলে নেন সন্তান, শেষযাত্রায় সন্তান কাঁধে নেয় তাঁকে–কখন দুই আত্মা এক হয়ে যান। সুতরাং নিজেকে নিজেই গল্প শোনানো যেন, ... তারপর? ... বাবা আর একটা? প্লাতেরো খেতে শুরু করে নতুন কবিতা। কোনও এক মায়াবী ডাক দিতে থাকেন ভিতরে, আঙুল খুলে নিয়ে একছুট দেয় শিশু–জড়িয়ে যেতে থাকে বাবার হাত–আর আমাদের ভিতরে ভিতরে জড়িয়ে যায় চাঁদ, জড়িয়ে যায় গাধা, জড়িয়ে যান হিমেনেথ আর শক্তি, বন্ধন আর মুক্তি। **মুখবন্ধের মুখোশে** সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বলা–কথাগুলো এ আলোচনায় কত গভীর, বোঝা যায়–

> মন্ত্র থেকে কবিতার জন্ম। কথার জোরে মনস্কামনা পূর্ণ করা। ডাঙায় দাঁড়িয়ে তা হওয়ার নয়। নিজেকে কথার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে।... না শব্দ, না ছন্দ কোনো কিছু দিয়েই তার কবিতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নয়। তার জাফরি দিয়ে সমানে হাওয়া খেলে। বুঝতে গিয়ে ঠকেছিলাম। অর্থের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে ঝাড়াহাতপা হয়ে কবে যে শক্তির সোনার তরীতে উঠে বসেছিলাম, আজ আর আমার মনে নেই।[২২]

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'–র ১০০(১)তম সনেটে ভেসে ওঠে শক্তির তৃপ্তির মুখচ্ছবি :

পরিকল্পনা, এই গ্রন্থ তাকে আপাদমস্তক
ডোবাবে অক্ষরে, জলে শব্দ হবে সাক্ষাৎ তরণী
ভরসার পারাপার দেখাবে যে নিশ্চিত আপন
ভেসে–যাওয়া পাল তুলে, ঝংকার, ঝড়ের মুখোমুখি!
পিছনে জানালা এই গ্রন্থ, তাকে অজন্মসম্প্রতি
দেখাবে বিমূঢ়, রূঢ়, লেলিহান জিহ্বা ও জীবনী
বস্তুত কবির এই ভালোবাসা, ভালবাসতে যাওয়া
এবং যা কিছু, যাকে শাস্ত্রে বলে: খেদ ও ক্রন্দন।
আনন্দও কম নেই...।[২৩]

যেসব সনেট রচনা করে গেছেন তিনি, শুধু স্তবক আর মিলবিন্যাসের চর্চা দিয়ে তার আভাকে কিছুমাত্র ছোঁয়া যায় না। সে কবিতা কখনো হয়ে ওঠে যে–কোনও ব্যর্থ হাহাকারের সান্ত্বনা :

.... আমি একা নই দুঃখে নিরঙ্কুশ
একা নই লক্ষভ্রষ্ট, চতুর্দিকে মানুষ মানুষ।[২৪]

কখনো নিজেই হাহাকারে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরতে চায় পা :

ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতাই নাই এ–দীনের
দয়াময়ী, দয়া করো, ভিখারিরে অন্নবস্ত্র দাও

রাখিও না মানহীন উলঙ্গ আলোকে প্রকাশিয়া
লোল তরবারি বাহ্য প্রাকৃতিক, নৈরাশে, হাওয়ায়।[২৫]

কখনো তুলকালাম যৌনতায় মানুষের হাংরি–স্বভাবকে প্রকট করে নিয়ে যায় আদালতের দোরগোড়ায় :

চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা। সমসাময়িক
নগরে, বৃষ্টির দিনে, নরনারী পুত্রার্থে ধেয়ায়
দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল। ।[২৬]

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্যে সে বলে :

আমরা কি কোনোদিন কুকুরেরও সমান হবো না
আমরা কি কোনোদিন আদুল গায়ের কায়িকতা
নিয়ে চেখে দেখিবো না মেয়ে মানুষের আশাতীত
রঙিন মলাটগুলি, বগলের নম্র মাংসগুলি।[২৭]

আবার কখনও সেই যৌনতাই শরীরের গন্ধ মেখে পৌঁছতে চায় সন্তানের পবিত্রতার কাছে :

আমাদেরও শরীরের আস্ফালন জেগেছে পাৎলুনে
না, তবু প্রেমের মাঝে হৃদয় জাগাতে চাই খুব
একমাস ধরে ডিমে তাপ দিয়ে দেখেছি, সঙ্গম
ঢের সোজা, এমনকি বেশ্যারও হৃদয়ে পথ আছে।[২৮]

আর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভাবের ঘনীভূত শরীরে শব্দ এবং তার আবহাওয়া ছড়িয়ে দিতে চায় নিজের উত্তরাধিকার। **পুত্রার্থে**–র মতো শব্দপ্রয়োগ মধুসূদনের পরে আর বিস্ময়কর নয় হয়তো, পাঠকের অপেক্ষিত কান হয়তো **ক্রিয়তে ভার্যা**–র জন্যও প্রস্তুত ছিল, **ধেয়ায়** সেকারণেই হয়তো আধুনিকের কানে লাগেনি, কিন্তু তারপরেই 'দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল!!' সনেটের ছোট শরীর এত জোর ঝাঁকুনি খায়নি এর আগে। Counterculture–এর এই অহং এই স্পর্ধা সনেটে সেকারণেই বোধহয় নিজেকে দিয়ে বলাতে পেরেছিল :

আমার বিশ্বাস আমি একা থাকবো উত্তরাধিকৃত
কিছুতে হবো না ছার কবিতার কিংবা ছা–বালকে![২৯]

তথ্যসূত্র :

১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মুখবন্ধের মুখোশে, *আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষজনায়*, মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩০।

২। শঙ্খ ঘোষ, *এই শহরের রাখাল*, আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষজনায়, প্রতিভাস, পৃষ্ঠা ৩৪।

৩। ৯৭–সংখ্যক, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*, পদ্যসমগ্র–১, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা–৯, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৮৯।

৪। সমাধিফলকের স্মৃতি–৭, *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান*, পদ্যসমগ্র–১, পৃষ্ঠা ২২৫।

৫। সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৮।

৬। *অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়*, ভূমিকা, পৃ. ১১–১২।

৭। সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত *পদ্যসমগ্র* ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা–৯, তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৯, পৃ. ২৯৪।

৮। *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৯৫।

৯। পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪২।

১০। পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪২।

১১। পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪৩।

১২। পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪১।

১৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩০।

১৪। ১৫–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪৮।

১৫। ১৭–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪৯

১৬। ১১–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪৬।

১৭। ২৭–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫৪।

১৮। ২৮–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫৪।

১৯। ২৯–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫৫।

২০। ৩৭–সংখ্যক,চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫৯।

২১। ১১–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ১৪৬–১৪৭।

২২। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০।

২৩। পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৯০।

২৪। ২–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪২।

২৫। ৯–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪৫।
২৬। ৩৩–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫৭।
২৭। ৮০–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৮০।
২৮। ১৯–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫০।
২৯। ৯৪–সংখ্যক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র–১, জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৮৭।